بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৩০ মার্চ ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩০ মার্চ ২০১২-এর (৩০ আমান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

গত খুতবায় বয়আতের শর্ত সমূহের বরাত দিয়ে আমি জামাতের সদস্যদেরকে একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি কি, তা বলেছিলাম আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে বয়আতের প্রতিটি শর্তের ব্যাখ্যা করেছিলাম। ঐ শর্তসমূহ এবং হুযূর (আ.)-এর রচনা ও মলফুযাত পড়ে এবং শুনে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যায় যে, তিনি (আ.) আমাদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের সংশোধনের মাধ্যমে আমাদের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কারণ এ ছাড়া সেই মহান উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয় যে উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর সেটিই ছিল যুগের প্রয়োজন আর আজও এটিই যুগের চাহিদা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায়।

তিনি (আ.) এক স্থানে বলেছেন, **'এ জামাত প্রতিষ্ঠার পিছনে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য যা তিনি আমার সামনে প্রকাশ করেছেন তাহলো, তাক্বওয়া (খোদা ভীতি) হ্রাস পেয়েছে। অনেকেই প্রকাশ্য নিলজ্জতায় লিপ্ত, অবাধ্যতা ও পাপাচারে নিমজ্জিত। কতক এমন আছে যাদের কর্মে এক ধরনের অপবিত্রতার মিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু তারা জানেও না যে, ভাল খাদ্যে যদি সামান্য পরিমাণ বিষ মিশে যায় তাহলে সমস্ত খাবারই বিষাক্ত হয়ে যায়। অনেকেই এমন আছে যারা ছোট ছোট পাপ যেমন, 'লোক দেখানো' ইত্যাদীতে লিপ্ত হয় যার শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। যদিও তারা বাহ্যতঃ মনেও করে যে তারা অত্যন্ত ধার্মীক, কিন্তু তারা 'আত্মশ্লাঘা' 'লোক দেখানো' এবং বিভিন্ন সূক্ষ্ম পাপাচারে লিপ্ত যা তত্ত্বজ্ঞানের অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই দেখা সম্ভব। এখন আল্লাহ্ তা'লা**

পৃথিবীবাসীদের তাক্বওয়া ও পবিত্র জীবনের আদর্শ দেখাতে চান। আর এ উদ্দেশ্যে-ই তিনি এ জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি পবিত্রতা চান এবং একটি পবিত্র জামাত গঠন করাই হলো তাঁর উদ্দেশ্য'।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা যিনি এ জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি এ জামাতে অন্তর্ভূক্তদেরকে বিশেষভাবে পবিত্র করতে চান যেন একটি পবিত্র জামাত গঠিত হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের প্রত্যেকের কাছে চান, আমরা যেন তত্ত্বজ্ঞানের অনুবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করি, এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রবৃত্তিকেও বিচার-বিশ্লেষণ করি। বিশ্বাস সংক্রান্ত ভ্রান্তির সংশোধনের পাশাপাশি আপন সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মগত ভ্রান্তিরও সংশোধন করি। নিজেদের কর্মকান্ডের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখি। তত্ত্বজ্ঞানের এই অনুবীক্ষণই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভুলভ্রান্তিকে বড় করে দেখায়।

কাজেই নিজেদের পাপসমূহ ও ভুলত্রুটিগুলোকে দেখার জন্য, স্বীয় দুর্বলতার প্রতি চোখ রাখার জন্য আমাদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতেই হবে যদ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তিকে পর্যবেক্ষন করতে সক্ষম হবো। এই চিন্তা-চেতনার সাথে আমাদের নিজেদের অবস্থা যাচাই করে দেখা দরকার। অতএব আমাদের আহমদী হবার দাবী কোন সাধারণ দাবী নয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতও কোন সাধারণ জামাত নয়। আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতের সভ্যদেরকে পবিত্র করে একটি পবিত্র জামাত গঠন করতে চেয়েছেন আর সে লক্ষ্য নিয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। এ কথা প্রত্যেক আহমদীকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে, খোদাভীতি ও পবিত্র জীবনাদর্শই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম আর আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের সংশোধন এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেবল বিশ্বাসগত সংশোধন কোন কাজে আসে না যতক্ষণ না এর সাথে কর্মের সংশোধন হবে এবং যতক্ষণ না আমাদের সবাই নিজেদের কর্ম সম্পর্কে সচেতন হবে যে অধিকন্তু আমাদের বিশ্বাস কিরূপ হওয়া উচিত এবং কোন ধরনের আমলের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত? যেমনটি কিনা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিতে পড়েছি, (তাতে) আমরা দেখলাম, ছোটছোট পুণ্যকর্মের প্রতিও মনোযোগী হওয়া এবং সেগুলো পালন করার চেষ্টা থাকা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথাই বলেছেন।

একস্থানে আরো স্পষ্টভাবে আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের মানদন্ড সম্বন্ধে জামাতের দৃষ্টি আর্কষণ করে তিনি (আ.) বলেন, আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম: (অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস, আমল বা কর্মের বিষয়টি এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে) **'আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারকথা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তাহলো, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন, 'খাতামুন্ নবীঈন' ও 'খায়রুল মুরসালীন' যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে এবং যে নিয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এখন এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা পবিত্র কুরআনের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে**

করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরো বিশ্বাস করি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া এর তুচ্ছমার্গেও পৌঁছতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না। আমাদের যা কিছু লাভ হয় তা প্রতিচ্ছায়া হিসেবে এবং তাঁর মাধ্যমে লাভ হয়। আমরা আরো বিশ্বাস করি, যে সব পুণ্যবান ও কামেল বুযূর্গ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্যে সম্মানিত হয়ে আধ্যাত্মিকতার সফর সম্পূর্ণ করেছেন তাদের সাথে তুলনামূলক মানদন্ডে আমাদের যদি উৎকর্ষতা লাভ হয় তবে তাও কেবল প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ। এছাড়া তাঁদের মাঝে কল্যাণের এমন কিছু দিকও ছিলো যেগুলো আমরা এখন কোনক্রমেই অর্জন করতে পারব না'। (ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পু:১৩৭-১৩৮) অর্থাৎ যাঁরা মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিলেন তাঁদের কিছু কল্যাণ এমন রয়েছে যেগুলো লাভ করা সম্ভব নয়, তাঁরা মহানবী (সা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

তিনি (আ.) আরো বলেন, **'যে পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম ধর্মের ভিত্তি রাখা হয়েছে সেগুলোর প্রতিও আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। আর আল্লাহ্‌র বাণী অর্থাৎ পবিত্র কুরআনকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরার যে নির্দেশ রয়েছে আমরা তাও পালন করছি। আর হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মতো আমরাও বলি, "হাসবুনা কিতাবুল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং হাদীস ও কুরআনের মাঝে বিরোধ ও মতানৈক্য দেখা দিলে হযরত আয়শা (রা.)-এর ন্যায় আমরাও কুরআনকে প্রাধান্য দেই।** (হাদীস ও কুরআনের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হলে) **বিশেষভাবে সেসব কাহিনীর ক্ষেত্রে যা সর্বসম্মতভাবে উল্লেখের বা লিখারও যোগ্য নয়। আর আমরা এ বিশ্বাসও স্থাপন করি যে, খোদা তা'লা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা আরো ঈমান রাখি, ফিরিশ্‌তা সত্য, পুনরুত্থান সত্য, হিসাব-নিকাশের দিন সত্য, জান্নাত এবং জাহান্নামও সত্য। আমরা আরো বিশ্বাস রাখি, মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে যা কিছু বলেছেন এবং আমাদের নবী করীম (সা.) যা বলেছেন উপরে উল্লিখিত বক্তব্যের নিরিখে তা সবই সত্য। আমরা আরও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের মাঝে এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করে অথবা আবশ্যকীয় ক্রিয়া-কলাপ বাদ দিয়ে বাছবিচার বিহীন** (অর্থাৎ নিজ ইচ্ছানুযায়ী যেখানে খুশি পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে, নিজ ইচ্ছানুযায়ী হালাল-হারাম প্রস্তাব করে) **কার্যকলাপের ভিত্তি রাখে সে ঈমান বিবর্জিত এবং ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত। আমি আমার জামাতকে উপদেশ প্রদান করছি, সবাই যেন এ পবিত্র কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্"র প্রতি বিশ্বাস রাখে, এবং এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর সকল নবী এবং সকল গ্রন্থ যেগুলো কুরআন দ্বারা সত্যায়িত হয় সেসব পুস্তকের প্রতি যেন বিশ্বাস রাখে এবং রোযা, নামায, যাকাত ও হজ্জ আর খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত ফরয সমূহকে আবশ্যকীয় জ্ঞান করে আর সকল নিষেধাজ্ঞাকে নিষেধ জ্ঞান করে সঠিকভাবে যেন ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা ঐসব বিষয় যেগুলোর প্রতি অতীত পুণ্যবানদের বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ঐকমত্য ছিল, ঐসব বিষয় যা সুন্নত অনুসারীদের** (অর্থাৎ সুন্নত পালনকারীগণ) **মতে ইসলাম বলে পরিগণিত ঐসব কিছু মান্য করা আবশ্যক। আর আমরা এ বিষয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, এটিই আমাদের ধর্ম বিশ্বাস'।** (আইয়ামুস সুলেহ্, পৃ: ৮৬-৮৭)

খোদা তা'লার সত্তা ব্যতিরেকে সব কিছুই নশ্বর এ বিশ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি (আ.) স্পষ্ট করেন, **'হযরত ঈসা (আ.)ও একজন মানুষ ছিলেন, আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন আর একারণে তাঁরও একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর মৃত্যু হয়েছে। হ্যাঁ, ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং ক্রুশের ক্ষত নিরাময় করেছেন এরপর তিনি হিজরত করেন এবং কাশ্মীরে মৃত্যুবরণ করেন'**।

যাহোক হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু বা তাঁর মৃত্যু বরণ সম্বন্ধে এক জাগায় তিনি (আ.) বলেন, **'আমি হযরত ঈসা (আ.)-কে মৃত এবং ঈমান ও বিশ্বাসের দিক থেকে তাঁকে প্রয়াতদের অন্তর্ভূক্ত মানি এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন আর কেনই বা বিশ্বাস করবো না যখন কিনা আমার অভিভাবক, আমার প্রভু নিজ সম্মানিত গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে তাঁকে মৃতদের দলভূক্ত করেছেন আর সমস্ত কুরআনে একবারও তাঁর অলৌকিক জীবন এবং দ্বিতীয়বার আগমনের উল্লেখ নেই বরং তাঁকে কেবল মৃত বলে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। তাই তাঁর স্বশরীরে জীবিত থাকা এবং পুনরায় কোন এক সময় পৃথিবীতে আগমন করা, না কেবল আমার নিজ ইলহামের ভিত্তিতেই বাস্তবতা পরিপন্থী জ্ঞান করি বরং ঈসার জীবিত থাকার এই ধারণাকে কুরআনের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত আয়াতের আলোকে অযৌক্তিক ও অসত্য মনে করি'।**

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে সব সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট আয়াতের আলোকে হযরত ঈসা (আ.)-কে মৃত মনে করি আর তাঁর জীবিত থাকার ধারণাকে অযৌক্তিক ও অসত্য মনে করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় এ-ও বলেন, 'বিশ্বাসগত দিক থেকে তোমাদের এবং অপরাপর মুসলমানদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তারাও ইসলামের রুকনসমূহ বা স্তম্ভ সমূহ মানার দাবী করে, তোমরাও মানার দাবী করে থাকো। একজন আহমদী ঈমানের স্তম্ভসমূহের প্রতি ঈমান রাখার যেমন দাবী করে অন্যরাও মৌখীকভাবে একই দাবী করে এমনকি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর একটি শ্রেণী হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেও বিশ্বাস করা শুরু করেছে। এরপর খুনী মাহদী সংক্রান্ত ধারণাও বদলে গেছে অর্থাৎ মাহদী এসে হত্যাযজ্ঞ চালাবেন এবং সংশোধন করবেন এতদসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। গত জুমুআর পূর্বের জুমুআয় আমি সাহাবীদের জীবনের ঘটনাবলী শুনিয়েছিলাম। তাঁদের মাঝে একজন সম্পর্কে বলেছিলাম, একজন সাহাবী যখন মৌলভী মুহাম্মদ হুসেইন বাটালভীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি খুনী মাহদীর ধারণা অস্বীকার করেছেন! আর মানুষকে আপনি ভিন্ন কিছু বলছেন। অথচ মির্যা সাহেব (হযরত মসীহ্ মওউদ) যখন বলেন, কোন খুনী মাহদী আসবে না- তখন আবার আপনি আপত্তি করেন। এর উত্তরে তিনি বলেন, যাও তোমার মির্যা সাহেবের হাতে বয়আত করতে ইচ্ছা হলে করো। আমার কী দৃষ্টিভঙ্গি আছে বা ছিল তা নিয়ে বিতর্ক করো না।

মোটকথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যখন ধৃষ্টতার সাথে দাড়ায় তখন তারা এটিই বলবে, খুনী মাহদীও আসবে আর মসীহ্ও আসবে। কিন্তু অনেকে এমন আছেন যাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে।

যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পর মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত কিছু বিশ্বাসের সংশোধন হয়েছে। এমনকি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আজ থেকে ৭৬ বছর পূর্বে 'বিশ্বাস ও কর্মের' সংশোধন শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি খুতবা প্রদান করেন আর তাতে এ-ও বলেছেন, হিন্দুস্থানে শিক্ষিত সমাজে সম্ভবতঃ দশ জনের একজনও এমন মানুষ পাওয়া

যাবে না যে ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকায় বিশ্বাসী। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে নাসেখ-মনসূখ বা বিভিন্ন আয়াত রহিত হবার বিষয়টি সাধারণত এখন আর উল্লেখ করা হয় না বরং বলা যায় সেই কট্টরতা দেখা যায় না যা ইতোপূর্বে ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটিও প্রমাণ করেছেন, কোন কোন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলমানরা বেশ কট্টর ছিল কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পর তারা নমনীয় হয়ে গেছে, কট্টরতা হ্রাস পেয়েছে। এখন হয়তঃ মানে নতুবা চুপ থাকে । আজও একই অবস্থা বিরাজমান। বরং এখন অনেক আলেম- উলামা, স্কলার যাদের মাঝে আরবের উলামা ও পন্ডিতরাও অন্তর্ভূক্ত; বিভিন্ন জিহাদী সংগঠন ও উগ্রপন্থীদের জিহাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছে। বরং তারা জিহাদের ব্যাপারেই বলতে শুরু করেছে, বর্তমান যুগে প্রচলিত জিহাদের ধারণা ভুল। অতএব যে ধ্যান-ধারণাকে তারা মৌলিক বিশ্বাস জ্ঞান করতো সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন, সেই বিশ্বাসে পরিবর্তন এবং তাদের মাঝে যারা শিক্ষিত শ্রেণী হিসাবে পরিচিত, সামাজিকভাবেও যাদের একটি অবস্থান রয়েছে এবং যারা সুপরিচিত, তারা জিহাদ প্রভৃতির ব্যাপারে বলতে শুরু করেছে, এগুলো ঠিক নয়, ভুল। এই পরিবর্তন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর, তাঁর (আ.) আবির্ভাবের পর এবং জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার পর সৃষ্টি হয়েছে। তারা আহমদীয়াত গ্রহণ করুক বা না করুক এটিও এ কথার প্রমাণ বহন করে, জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাসমূহের যতটুকু সম্পর্ক আছে অ-আহমদীদের মধ্য থেকে একটি বড় শ্রেণী মানতে বাধ্য হচ্ছে। এখন এ যুগে বেশীরভাগ বিতর্ক এ কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা নবীর মর্যাদা কিনা? ইনশাআল্লাহ্ একদিন এরও মিমাংসা হয়ে যাবে। তেমনিভাবে আমাদের জামাতের বিশ্বাসগত যে অবস্থান রয়েছে, শিক্ষা রয়েছে এবং যে আক্বিদা রয়েছে যারা এগুলোকে বুঝতে চায় না, ধৃষ্টতা দেখায় অথচ তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণও নেই; আমাদের সাথে তর্কযুদ্ধে যখন নির্বাক হয়ে যায় তখন তারা মারামারি কাটাকাটির পথ বেছে নেয়। আর বর্তমানে মুসলমান ফির্কাগলোর অধিকাংশের পক্ষ থেকে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে এসব কিছুই ঘটছে। বিশেষভাবে পাকিস্তান এবং ভারতের কোন কোন স্থানে। এটি এ বিষয়ের বর্ধিত প্রমাণ, আমাদের বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করার জন্য না তাদের কাছে কোন কুরআনের প্রমাণ আছে আর না-ই কোন যৌক্তিক প্রমাণ আছে। তারা যখন নিরুত্তর হয়ে যায় এবং (দলীল উপস্থাপনে) ব্যর্থ হয় তখন তারা মারামারি করতে শুরু করে। কাজেই বিশ্বাসের দিক থেকে এবং দলীল-প্রমাণের দৃষ্টিকোন থেকে জামাতে আহমদীয়া সেই আসনে সমাসীন যেখানে কোন ব্যক্তি এর সামনে দাঁড়াতে পারে না। যে সব আহমদী স্বল্পজ্ঞানী তাদের উচিত জ্ঞানে পরিপক্কতা অর্জন করা। আজ কাল ‘রাহে হুদার’ মত অনুষ্ঠানাদি (ধর্মীয়) এ উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হচ্ছে। এগুলো থেকে বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করুন। কোন আহমদী যেন হীনমন্যতার শিকার না হয়। যাহোক আল্লাহ্‌র কৃপায় আহমদীয়া জামাতের হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নিজ বিশ্বাসে দৃঢ়। কেউ যদি দুর্বলও থেকে থাকে তবে সে যেন মনে রাখে, যে ধর্ম বিশ্বাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তাহলো প্রকৃত ইসলাম এবং এ বিশ্বাসকে কেউ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল সাব্যস্ত করার ক্ষমতা রাখে না। অতএব যে ক’জন দুর্বল আছেন তারা যেন নিজেদের মাঝে দৃঢ়তা সৃষ্টি করেন। কোন ধরনের দুর্বলতা দেখানোর প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস এবং ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সমৃদ্ধ সাহিত্য দিয়ে গেছেন, অনুরূপভাবে ব্যবহারিক বিষয়াদীর প্রতিও গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্ম বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ পুস্তকাদির প্রভাব অন্যদের উপরও রয়েছে। তবুও মনে রাখতে হবে, কেবল বিশ্বাসের সংশোধনই সবকিছু নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্মের সংশোধনের জন্যও এসেছেন। আমাদের কর্মের সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাসের সংশোধন কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। কেননা কর্ম এমন এক বিষয় যা অন্যদেরকে জামাতভূক্ত হওয়া, আমাদের কথা শোনা বা নিদেনপক্ষে বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত থাকার প্রেরণা যোগায়। পুণ্যকর্ম এবং পবিত্র পরিবর্তন হলো এক নিরব তবলীগ। জামাতের কাছে এসে গেছে অথবা বয়আত গ্রহণে প্রস্তুত কতক মানুষ কোন-কোন আহমদীর কোন কর্মের কারণে হোঁচট খায় এবং দূরে সরে যায়।

কাজেই এ সময় যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ হতে (কালের নিরিখে) দূরে চলে যাচ্ছি তখন আমাদের বিশ্বাসের পাশাপাশি কর্মের সংশোধনও একান্ত আবশ্যক। বিশ্বাসের যুদ্ধে ইতোমধ্যেই আমরা জয়যুক্ত। কিন্তু বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম না হলে, শিক্ষা অনুযায়ী না চললে এবং তা নিজ জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা না হলে, কালের প্রবাহে কেবল নামই অবশিষ্ট থেকে যায়। যেমনটি কিনা অধিকাংশ মুসলমানদেরকে আমরা দেখছি, তারা ভুল কাজে লিপ্ত। নামাযও পড়ে পড়তে হবে তাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। মিথ্যা সর্বত্র বিরাজমান। প্রকাশ্যে ও নির্বিচারে চরম নিলর্জ্জতা দেখা যায়।

সম্প্রতি এক অ-আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমার মাথায় ঢুকে না, উগ্রপন্থীরা এবং মুসলমান হওয়ার দাবীদাররা যারা ইসলামের নামে আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশের নামে বিভিন্ন স্থানে হামলা করে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, স্কুলে হামলা চালায়, নিরীহ নারী-শিশুদের হত্যা করছে, কিন্তু আমি পাকিস্তানে যাবার পর দেখলাম ইসলামাবাদের এক মহাসড়কের উপর মদ বানানোর কারখানা অবস্থিত যাকে "বেভরী" বলে কিন্তু এর উপর কোন উগ্রপন্থী হামলা করে নি অথচ এটি সবার চোখের সামনে। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, পাকিস্তানে টিভি চ্যানেলগুলোতে নগ্ন ও বেহুদা অনুষ্টানাদিও দেখানো হয় আর বিভিন্ন ইসলামী চ্যানেলেও দেখানো হয়। এর বিরুদ্ধে কেউ সরব হয় না, হামলাও করে না। যাহোক এ হলো ইসলামপন্থীদের ব্যবহারিক অবস্থা। অথচ মহানবী (সা.) মদ প্রস্তুতকারী, মজুদকারী, বিক্রেতা, পানকারী, পরিবেশনকারী সকলকে অভিসম্পাত করেছেন। সেখানে মদের কারখানা চালু রয়েছে, এ অভিশাপ তারা মেনে নিতে পারে কিন্তু আহমদীদের কলেমা পাঠ তাদের কিছুতেই সহ্য হয় না। যাহোক বলছিলাম যে আমরাও এই সমাজে বসবাস করছি। এ সমাজের প্রভাব আমাদের উপরও পড়তে পারে তাই আমাদের সাবধাণতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন; তাহলেই আমরা প্রয়োজনীয় সাবধাণতা অবলম্বন করতে পারবো। বিশেষভাবে বড়দের দায়িত্ব শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা। যুবকদের স্বয়ং সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বর্তমানে শত্রু ঘরে প্রবেশ করে নৈতিকতা বিধ্বংসী কার্যকলাপের মাধ্যমে সবার আচার-আচরণকে কলুষিত করার চেষ্টারত। যেমন আমি বলেছি, টিভি চ্যানেলসমূহ নৈতিকতা ও সৎকাজের সংজ্ঞাই পাল্টে দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইন্টারনেট ও অন্যান্য উপকরণ রয়েছে। আমরা সবাই মিলে যদি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করি তবে কর্মের সংশোধন দূরে থাক, শয়তানী কর্মের ঝুলিতে আমরা নিজেরাই পতিত হব। এ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য

লাভের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং একইসাথে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভে সচেষ্ট হোন। এজন্য আমাদেরকে খোদা তা'লাকে ডাকতে হবে। তখনই আমরা বাঁচতে পারবো। শুধু এতটুকু বলা যথেষ্ট নয় যে, আমি এক খোদায় বিশ্বাস রাখি বরং এক খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনও আবশ্যক যেন ঐসব শয়তানী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়াও সম্ভব হয় যা আমাদের ঘরের অন্দরমল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নয়তো এসব অনিষ্ট ও ব্যাধি থেকে বাঁচার আর কোন পথ খোলা নেই। কথিত আছে, একজন বুযূর্গের এক শিষ্য ছিল। শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে যাবার সময় সেই বুযূর্গ শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার যে দেশে যাচ্ছো এবং যে দেশে থাকো সেখানে শয়তান আছে কী? শিষ্য অবাক হয়ে বললো, শয়তান আবার কোথায় নেই? সর্বত্রই শয়তান বিদ্যমান। তখন তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে যা কিছু শিখেছো ও পড়েছো, যখন সেগুলো পালন করবে তখন যদি শয়তান আক্রমন করে তবে কি করবে? সে বললো, শয়তানের মোকাবিলা করবো। বুযূর্গ বললেন, ঠিক আছে। এরপর তোমার দৃষ্টি যখন অন্য দিকে যাবে তখন যদি সে আবার আক্রমন করে তবে কি করবে? সে বলল, পুনরায় রুখে দাঁড়াবো। তিনি দু'তিনবার এভাবে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি যদি তোমার কোন বন্ধুর কাছে যাও এবং তার দরজায় কুকুর বসা থাকে এবং সে তোমাকে কামড়াতে আসে, তোমার পথে বাধ সাধে, তোমার উপর আক্রমন করে, তখন কি করবে? সে বলল, আমি তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করবো। পুনরায় আক্রমন করতে আসলে অনুরূপই করবো। তিনি বললেন, তুমি যদি এভাবে এর পেছনেই লেগে থাকো তবে তোমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করতে পারবে না। তখন তুমি কি করবে? সে বললো, তাহলে আমি আমার বন্ধুকে ডাকবো যে এসে তোমার কুকুর সামলাও। তখন বুযূর্গ বলতে লাগলেন, শয়তানও খোদা তা'লার কুকুর। এজন্য তোমাকে খোদা তা'লাকে ডাকতে হবে, তাঁর দরজায় কড়া নাড়তে হবে। তখনই তোমরা শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচতে পারবে। এ ভ্রান্তিতে থেকো না যে, এখন আমাদের জ্ঞানও অর্জিত হয়েছে এবং চারিত্রিক শিক্ষামালাও রপ্ত করেছি। সৎকাজ কাকে বলে তাও আমরা জানি আর যেমনই হোক আমরা নামাযও পড়ি। যদি এ ধারণার বশবর্তী থাকো তবে শয়তান তোমাদের উপর আক্রমণ চালাতেই থাকবে এবং তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

অতএব বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। খাঁটি অন্তরে তাঁর ইবাদত করা প্রয়োজন। তখনই আমরা সেই শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচতে পারবো। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা এবং নিজের অঙ্গীকারকে নবায়ন করাই যথেষ্ট নয়। তাই সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি, তাঁর সমীপে অবনত হতে হবে। একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে হবে। ব্যবহারিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও তওবা-ইস্তেগফারের পাশাপাশি একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো নামায। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বার বার নামায প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবার মহানবী (সা.) বলেছেন, নামায হলো মু'মিনের মে'রাজ অর্থাৎ এমন অবস্থার নাম যখন মু'মিন খোদা তা'লার নিকটে অবস্থান করে এবং তাঁর সাথে বাক্যালাপ করে। অতএব শয়তান থেকে বাঁচতে হলে, যুগের অহেতুক ও বৃথা কার্যকলাপ থেকে রেহাই পেতে হলে নিজেদের নামাযের সুরক্ষা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা সফল মু'মিনের লক্ষণ এটিই বর্ণনা করেছেন, তারা তাদের নামাযের হিফাযত করে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (সূরা আল্ আন্কাবূত:৪৬) অর্থাৎ নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে। অর্থাত সে নামায যা বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য পড়া হয়।

অতএব শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য খোদা তা'লার সাহায্য যাচনার একটা বড় মাধ্যম হলো নামায। নিরর্থক কার্যকলাপে পরিপূর্ণ আজকের এই সমাজে এ বিষয়ের প্রতি আমাদের আরো বেশি মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। সন্তাদের তত্ত্বাবধানও আবশ্যক যেন তাদের ভেতর নামায পড়ার অভ্যাস অভ্যাস গড়ে উঠে। কিন্তু শিশু-কিশোর ও যুবকদেরকে বলার পূর্বে বড়দেরকে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা **"ইউকিমুনাস্ সালাত"** বলেছেন এর অর্থ হলো, নামায যেন জামাতবদ্ধভাবে পড়া হয়। এদিকে যেন মনোযোগ দেয়া হয়। আমি দেখেছি ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে সময় যখন ঘড়ির কাটা পিছিয়ে যায়, রাত ছোট হতে থাকে তখন ফজরের নামাযের উপস্থিতি হ্রাস পায়। কিছুদিন পূর্বেকার কথা সময় তখনও তত বেশি পেছোয় নি, পাঁচটাতেই নামায হতো, তবুও ফজরের নামাযে উপস্থিতি কমতে দেখা যায়। এখন আবার ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে এসেছে তাই উপস্থিতি কিছুটা ভাল হয়েছে। অথবা শুক্রবার উপস্থিতি কিছুটা ভাল হতে দেখা যায়। এখন সময় আরো পিছিয়ে যাবে। কাজেই বড়দেরও এদিকে গভীর মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। সময় পিছানোর কারণে আবার আলস্য শুরু হবে- এটি একজন আহমদীর জন্য সমীচীন নয়। এজন্য আমি প্রথমেই মনোযোগ আকর্ষণ করছি, সময়ের প্রেক্ষিতে ফজরের নামাযের উপস্থিতি যেন কম না হয়। কর্মকর্তাতের পক্ষ থেকে যদি আলস্য প্রদর্শিত হয়, তারা যদি বাজামাত নামায পড়ার ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন না করেন, তারা যদি নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন, আর প্রত্যেক সংগঠনের পদাধিকারীরা যদি মসজিদে আসতে আরম্ভ করেন তাহলে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। আর শিশু-কিশোর ও যুবকদের মাঝেও এর প্রভাব পড়বে, তাদেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, কারো মর্যাদা কোন পদের কারণে নয়। পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টিতে কোন কর্মকর্তার হয়তো কোন পদমর্যাদা থেকে থাকবে কিন্তু আসল জিনিস হলো, খোদা তা'লার ভালবাসা অর্জন করা, আর এটি সেভাবে অর্জিত হবে যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন অর্থাৎ নামায হলো মে'রাজ, এই মে'রাজ লাভের চেষ্টা করতে হবে ।

অতএব প্রথমে কর্মকর্তাগণ আত্মজিজ্ঞাসা করুন, পরে নিজের প্রভাবাধীন শিশু- কিশোর, যুবক ও অন্যদের এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করুন। আমাদের সফলতা তখন প্রকৃত মহিমায় প্রকাশিত হবে যখন সকল দিক থেকে আওয়াজ আসবে- নামায প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো, নতুবা কেবল এ বিশ্বাস পোষণের মাঝেই আমাদের সফলতা নিহিত নয় যে, হযরত ঈসা (আ.) মারা গেছেন অথবা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত রহিত হয়নি, অথবা নবীগণ নিষ্পাপ বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, ইসলামে যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এটি আমাদের জন্য কোন সফলতা বয়ে আনবে না। খোদা তা'লা আমাদেরকে যে শিক্ষামালা প্রদান করেছেন নিজেদের কর্মসমূহকে সে রঙ্গে রঙ্গিন করার মাঝেই আমাদের সফলতা নিহিত। যার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নামাযের মাধ্যমে খোদার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন। অন্যথায় আমরা শির্ক করবো না আমাদের এ দাবী ভুল হবে। যদি নিজের নামাযের হিফাযত না করি তাহলে তা শির্কে লিপ্ত হওয়া বৈ-কি। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো নামায প্রতিষ্ঠা করো, নামাযের জন্য আসো। যদি নামাযের হিফাযত না করা হয় তার অর্থ দাঁড়াবে নামাযের তুলনায় অন্য কোন বস্তুকে

অগ্রগণ্য করা হচ্ছে যা সুপ্ত শির্ক বা অংশীবাদীতা। এরপর খোদা তা'লা যেসব সৎকর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার মাঝে অন্যদের প্রাপ্য প্রদানের বিষয়টিও রয়েছে। জাগতিক লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের অধিকার খর্ব করা হয়। তখন খুবই লজ্জিত হই এবং আক্ষেপ হয় যখন আমার নিকট জামাতের বাহিরের লোকদের এরূপ চিঠি আসে, আপনার জামাতের অমুক আহমদী আমাকে প্রতারিত করেছে; আমাকে আমার প্রাপ্য প্রদান করা হোক। এ ধরনের বিষয়গুলো তবলীগের ক্ষেত্রেও অন্তরায় সৃষ্টি করে বরং কোন কোন নতুন আহমদীর পদস্খলনেরও কারণ হয়। সম্প্রতি একজন আরব আহমদী লিখেছেন, আমি জামাত ছেড়ে যাচ্ছি। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেলো, কতিপয় আহমদীর কর্মকান্ডে মনকষ্ট পেয়ে তিনি একথা বলছেন। কিন্তু বিশ্বাসের দিক থেকে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবী সত্য। অতএব কতিপয় আহমদীর কর্মকান্ড দেখে জামাত থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং ব্যবস্থপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যেখানে তার ভুল সেখানে সেসব আহমদীরও একটু ভাবা উচিত; যাদের মাঝে কতিপয় কর্মকর্তাও রয়েছেন। যাদের কর্মকান্ড অন্যের হোঁচট খাবার কারণ হচ্ছে আর তারা কত বড় পাপের বোঝা বহন করছে।

একটি বিষয়ের প্রতি আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের সদস্যগণ নিঃসন্দেহে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে থাকে কিন্তু যাকাতও আর্থিক কুরবানীর একটি দিক। এদিকেও সবিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। বিশেষভাবে মহিলাদের, যাদের কাছে অলংকারাদি থাকে আর সেসব মানুষ যাদের নিকট বছরাধিক কাল পর্যন্ত টাকা গচ্ছিত পড়ে থাকে। এদিকে একজন আহমদীর যেরূপ দৃষ্টি থাকা উচিত সেরূপ নেই। একটি শ্রেণী অবশ্যই এরূপ রয়েছেন যারা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এক একটি পয়সা হিসাব করে চাঁদা প্রদান করেন এবং যাকাতও দেন। কিন্তু অনেক এমনও রয়েছেন যারা চাঁদা দেয়াই যথেষ্ট মনে করেন এবং যাকাত দেন না। অথবা সেক্রেটারী মাল সাহেব এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না। যে কারণে তারা এর গুরুত্ব সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখে না। কাজেই এদিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এরপর ব্যবহারিক অবস্থার পরিবর্তনে কুরআনে বর্ণিত প্রত্যেক প্রকার অহংকার পরিত্যাগ এবং সকল প্রকার সৎকর্ম করা অন্তর্ভূক্ত। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশকে সর্বদা সম্মুখে রাখতে হবে অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের সাতশত আদেশ-নিষেধের একটিরও অমান্য করবে না। আমাদেরকে সর্বদা সকল তুচ্ছাতিতুচ্ছ পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে যেতে হবে। প্রারম্ভে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্বৃতি পাঠ করেছি তাতে তিনি একথাই বলেছেন, ছোট ছোট পাপ করে মনে কর না যে, এগুলো কোন পাপ নয়। এমন পাপ যা বাহ্যতঃ কারো দৃষ্টিগোচর হয় না সেগুলোকে নিজেদের তত্ত্বজ্ঞানের অনুবিক্ষণ যন্ত্রে দেখো, স্বয়ং অন্বেষণ করো আর আত্মজিজ্ঞাসা করো। তবেই বুঝতে পারবে এটি আসলেই গুনাহ্ বা পাপ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লোক দেখানোর উদাহরণ দিয়েছেন। এখন এটি অধিকাংশের চোখেই পড়বে না। মানুষ যদি বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে আত্মপর্যালোচনা করে তাহলে নিজেই বুঝতে পারে, সে যে কাজ করছে তা কি জগতকে দেখানোর জন্য না কি খোদা তা'লার জন্য। যদি মানুষ এটি জানতো যে আমার প্রতিটি কর্ম খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত এবং হতে হবে তখনই সওয়াব হবে এবং তখনই তারা পুণ্যকর্মসমূহের জন্য চেষ্টা করবে। যদি মানুষ এই দৃঢ় কথার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আমার প্রতিটি কর্ম খোদা তা'লার সন্তুষ্টির মানসে হওয়া উচিত

কেবল তবেই আমি পুণ্যের ভাগী হবো, তখনই কেবল সে প্রকৃত পুণ্যার্জনের চেষ্টা করবে, বেশি বেশি পুণ্যের অনুসন্ধানে থাকবে, পুণ্যের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালনার চেষ্টা করবে। এটি হলে লোক দেখানোর ব্যাধিও থাকবে না আর না অন্যান্য পাপেরও জন্ম হবে না। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ রয়েছে। এ গন্ডিতে সর্বপ্রথম আসবেন মা-বাবা এবং স্ত্রী-সন্তান। এরপর সম্পর্কের নিরিখে অন্যরা অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ব্যাপারে একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বর্তমানে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের মাঝেই ধৈর্যের বড় অভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ ধৈর্য ও সহ্যের ব্যাপারেও খোদা তা'লা খুবই তাকিদ করেছেন। এ ধৈর্যের অভাবে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। যাদের সন্তান- সন্ততি আছে তাদের কারো এ নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই যে, এর পরিণামে তাদের সন্তানদের উপর কী প্রভাব পড়বে। কাজেই উভয় পক্ষে খোদাভীতির অভাব এবং কর্মের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এছাড়া প্রত্যেক আহমদীকে এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত, আমাদের সত্যতা অন্যদের সামনে তখনই প্রকাশ পাবে যখন সব বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে সততা প্রকাশ পাবে। যদি ব্যক্তিগত বিষয়াবলীতে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের আচার-আচরণ স্বার্থপরতাপূর্ণ হয় তাহলে বয়আত গ্রহণের পর কর্মের সংশোধনের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেটিকে আমরা রক্ষা করতে পারবো না। পবিত্র কুরআন বলে, যদি তোমাদেরকে সত্য ও ন্যায়বিচারের জন্য নিজের বিরুদ্ধে অথবা নিজের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অথবা নিজের আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেও স্বাক্ষ্য দিতে হয় তবুও দিবে। কিন্তু কার্যতঃ আমাদের আচার-আচরণ যদি এর পরিপন্থী হয় তাহলে আমরা কী বিপ্লব ঘটাবো? আমি প্রায়শঃ অমুসলিমদের সামনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশেরও বরাত দিয়ে থাকি এবং দাবী করি, একমাত্র আহমদীয়া জামাতই সঠিক ইসলামী শিক্ষার উপর পরিচালিত। কিন্তু আহমদী সম্পর্কে যদি কোন অ-আহমদীর অভিজ্ঞতা ভিন্নতর হয় তাহলে তার উপর আমার এ কথার কী প্রভাব পড়বে ? এমন আহমদী, আহমদীয়াতের প্রচারের পথে বাঁধা। কাজেই আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন, আত্মজিজ্ঞাসা করা দরকার। পবিত্র কুরআনের অগণিত এমন নির্দেশাবলী রয়েছে।

অতএব আমাদের কর্মের পুরোপুরী সংশোধন তখনই হবে যখন আমরা সার্বিক দিক থেকে স্বয়ং নিজেদের পর্যালোচনা করবো, নিজেদের বদভ্যাসের প্রতি সমালোচনমূলক দৃষ্টি রাখবো। আমাদের কর্মের সংশোধন হলেই আমরা বুঝতে পারবো, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। নতুবা শুধু মান্য করে তাঁর সকল দাবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে একটি অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলাম ঠিকই কিন্তু অন্য অংশকে ছেড়ে দিলাম যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজেই যেভাবে আমি বলেছি, প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পুণ্যকর্ম করাও আবশ্যক। মানুষ জানে না তার জন্য কোন সৎকর্মটি ছোট আর কোনটি বড়? হাদীস থেকে প্রমাণিত, একটি নেকী একজনের জন্য ছোট কিন্তু আরেকজনের জন্য বড় বা এর সংজ্ঞা ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! বড় পুণ্যকর্ম কোনটি? তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। আর একস্থলে অপর একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, বড় নেককর্ম কোনটি? তিনি (সা.) বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। তৃতীয় বার আর একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! বড় নেককর্ম কোনটি? তিনি (সা.) বললেন, তাহাজ্জুদের নামায পড়া। তাহাজ্জুদে নফল নামায পড়া। তিনি (সা.) এভাবে বিভিন্ন লোকের মনোযোগ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি

আকর্ষণ করেছেন। বড় নেককর্ম তিন অথবা তিনের অধিক হতে পারে না। অন্যান্যদের দৃষ্টিও এভাবে তাদের দুর্বলতা অনুযায়ী বিভিন্ন নেককর্মের প্রতি আকর্ষণ করে থাকবেন। বড় পুণ্য কেবল একটিই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দৃষ্টিতে কারো জন্য সবচেয়ে বড় কাজ এবং পুণ্য সেটি কারো মাঝে যেক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। অতএব কোন ব্যক্তি যদি পিতা-মাতার সেবা না করে থাকে বা স্ত্রী-সন্তানের অধিকার প্রদান না করে থাকে তাহলে তার জন্য ধর্মের সেবা করাটা বড় পুণ্যকর্ম নয়। হতে পারে সে এই সেবা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য বা নাম ও প্রদর্শনের মানসে করছে। অতএব এমন লোক যাদের পরিবার তাদের আচরণে অতিষ্ঠ এবং যারা জামাতী কর্মকর্তা সেজে বসে আছেন তাদের সেবার প্রতিদান পেতে হলে এবং ধর্মীয় কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে হলে পিতা-মাতা এবং স্ত্রী-সন্তানের অধিকার প্রদান করাও আবশ্যকীয়। যদি কোন ব্যক্তি চাঁদা প্রদানে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও নামায ও নফল আদায়ের ক্ষেত্রে দুর্বল থাকে তাহলে তার জন্য পুণ্যকর্ম হলো নামায এবং নফল আদায় করা। এমনিভাবে অনেক পুণ্যকর্ম রয়েছে যা একজনের জন্য সাধারণ কিন্তু অন্যদের জন্য অনেক বড়। অতএব পুণ্যের ক্ষেত্রে ছোট-বড়র কোন তালিকা নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- যে বলেছেন 'ছাট ছোট পাপ যেমন লোক দেখানো' এখানেও এর অর্থ হলো, বাহ্য দৃষ্টিতে ছোট পাপ কিন্তু আসলে তা বড় পাপে পরিণত হয়। নামায আদায় করা অনেক বড় পুণ্যের কাজ, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম এবং ধর্মের মে'রাজ স্বরূপ। কিন্তু লোক দেখানো নামায গ্রহণীয় হয় না বরং প্রত্যাখ্যাত হয়। এভাবে একজন নামাযী হওয়া সত্ত্বেও যদি অপরের অধিকার হরণ করে তাহলে এই নামায পুণ্য নয় বরং উত্তম হতো যদি সে অন্যের প্রাপ্য প্রদান করে নামায পড়তো এবং নামাযের পুণ্য অর্জন করতো!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতি আমি পড়েছি, সেখানে তিনি (আ.) ইসলামের রুকন বা স্তম্ভসমূহের উল্লেখ করেছেন। রোযাও একটি স্তম্ভ। রমযানের রোযা রাখার ব্যাপারে মুসলমানরা পুরো প্রস্তুতির সাথে আয়োজন করে কিন্তু অনেক রোযাদার এমনও রয়েছে যারা রোযা রেখে মিথ্যা, প্রতারণা, গালি-গালাজ ও পরচর্চা ইত্যাদী করে থাকে আর এর ভিত্তিতে কার্যসাধন করে। মহানবী (সা.) উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখে এসব কাজ করে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তার রোযা রোযা নয়। অতএব রোযার প্রতিদানও নষ্ট হলো। তাই মূল বিষয় হলো, এসব কাজ সেভাবে করা উচিত যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব মানব জীবনের প্রতিটি প্রদক্ষেপ খুবই সতর্কতার সাথে এবং ধীরে ধীরে নেয়া উচিত যেখানে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি থাকবে সর্বাগ্রে। যেখানে বিশ্বাসের দৃঢ়তা থাকবে সেখানে কর্মও এমনই সংশোধিত হওয়া চাই যার ফলে একজন আহমদীর সাথে অন্যের কি পার্থক্য তা পৃথিবীবাসীর সামনে প্রতিভাত হবে? অতএব আমাদেরকে সব ধরনের মন্দ এড়িয়ে চলার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। সব ধরনের পুণ্য অবলম্বন করতে হবে যেন কার্যতঃ আমাদের মাঝে পরিবর্তন আসে। যেন ছোটদের জন্য আদর্শ হতে পারি, যুবকদের জন্য আদর্শ হতে পারি। ঘরে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য এবং কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হতে পারি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেক ছোট বড়কে সেই মানে অধিষ্ঠিত হওয়া চাই যে পর্যায়ে কোন প্রকার মন্দ এবং পাপের বীজ আর মানুষের মাঝে থাকতে পারে না আর যেন তা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। যদি জামাতের সদস্যদের প্রত্যেকেই নিজের উত্তম সংশোধনের চেষ্টা না করে তাহলে জামাতের ভেতর

সর্বদা কোন না কোন প্রকার পাপের বীজ থেকেই যাবে আর সুযোগ পাওয়া মাত্রই এর কুৎসিৎ রূপ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করবে।

অতএব আমাদের সবার জীবন থেকে সব ধরনের মন্দের মূলকে উৎপাটন করা আবশ্যক, কেবল তাহলেই আমরা সব ধরনের মন্দকে জামাত থেকে নিঃশেষ করে ব্যবহারিক সংশোধনের সত্যিকার প্রতিচ্ছবি হতে পারবো। আর তখনই বিজয়ের দৃর্শাবলী আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দেখাবেন। তবেই আমাদের দোয়াসমূহ গৃহীত হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও আমরা অর্জন করতে পারবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সে সুযোগ দান করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)